মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-৩

আমাদের আলোচনার বিষয় হলো, সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি কি না? তাঁরা সত্য পথের ওপর ছিলেন, এ কথা তো সবাই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে। লা-মাযহাবীরা কিন্তু সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মানতে মোটেও প্রস্তুত নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা সাহাবায়ে কেরামের আলোচনা করতে গিয়ে এমন সব অকথ্য এবং অশ্রাব্য মন্তব্য করেছে, যা কোনো সাধারণ মুসলমানের জন্য ব্যবহার করা সমীচীন নয়। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে তাদের অশালীন মন্তব্যগুলো তাদেরই রচিত গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করতে আমরা চেষ্টা করব।

'হাদিয়াতুল মাহদী', লা-মাযহাবীদের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ। লেখক ওয়াহীদুজ্জান হায়দারাবাদী। ওই গ্রন্থে তিনি লেখেন,

فان كثيرا من متاخرى علماء هذه الامة كانوا افضل من عوام الصحابة فى العلم والمعرفة ونشر السنة وهذا مما لاينكره عاقل۔

অর্থ : এই উম্মাহর পরবর্তী আলেমদের মধ্যে এমন অনেক আলেম আছেন, যারা জ্ঞান-প্রজ্ঞা, সুন্নাহর প্রচার-প্রসারে অনেক সাধারণ সাহাবী থেকে উত্তম। এ কথাকে অস্বীকার করা কোনো বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। (খণ্ড-১, পৃ.-৯০)

একই গ্রন্থে লেখেন,

لكنه يمكن لبعض الاولیا وجوه اخرى من الفضيلة

অর্থ : অনেক অলী এমন গুণাগুণে ভূষিত হতে পারেন, যা সাহাবীর মধ্যে নেই। (প্রাগুক্ত)

একই গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

لا يقال تفضيل الشيخين مجمع عليه حيث جعلوه من امارات اهل السنة لا نا نقول دعوى الاجماع غير مسلم

অর্থ : যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, শায়খাইনের (হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) শ্রেষ্ঠত্বের ওপর উম্মাহর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যেহেতু বিষয়টিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম নিদর্শন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যুত্তরে আমরা বলব, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এই দাবি করা অগ্রহণযোগ্য। (প্রাগুক্ত)

ওই গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে,

غير ان هذه الفضيلة للجمهور على الجمهور لا لكل فرد من افراده

অর্থ: সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এই বিধান স্বতন্ত্রভাবে সব সাহাবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। (খণ্ড-১, পৃ.-১০৫)

একই গ্রন্থকারের আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে লুগাতুল হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে,

ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ نے ایسے کام کئے ہیں جو شرعا اور عقلا ہر طرح مذموم ہیں

অনেক সাহাবী থেকে এমন কাজও সংঘটিত হয়েছে, যা শরীয়ত এবং যুক্তি, উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিন্দিত এবং অগ্রহণযোগ্য। (খ.-২ পৃ.-৫৬৪)

অন্যত্র আছে,

مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ خلفاء کا فعل بھی سنت ہے ، سنت تو آنحضرت ہی کا قول وفعل ہے کیونکہ آپ خطا سے معصوم تھے اور آپ کے خلفاء معصوم نہیں

অর্থাৎ খোলাফাদের কাজকর্ম এবং কথাবার্তা সুন্নাত নয়। (পৃ. ১০৯)

একই গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ معاویہ اور عمرو بن العاص دونوں باغی اور سرکش اور شریر تھے اور دونوں صاحبوں کے مناقب یا فضائل بیان کرنا ہرگز روا نہیں بلکہ صرف صحابیت کا لحاظ کر کے ان کے ذکر کو سب وشتم سے پاک رکھنا ہی کافی ہے۔

অর্থাৎ এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই যে, মু'আবিয়া এবং আমর ইবনুল আ'স উভয়জন রাষ্ট্রদ্রোহী এবং কুচক্রী ছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ) তাদের গুণকীর্তন করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। সাহাবী হওয়ার কারণে তাদের গালমন্দ না করাটাই যথেষ্ট। (প্রাগুক্ত পৃ. ৭০)

তাদের আক্বীদা দেখুন,

ان لوگوں کو یہ معتبر تاریخی روایات نہیں پہنچیں کہ معاویہ برسر منبر حضرت علی کو برا کہا کرتے تھے بلکہ دوسرے خطیبوں کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ وہ ہر خطبہ میں جناب امیر کو برا کہیں معاذ اللہ ان پر لعنت کرتے رہیں، سچی بات یہ ہے کہ معاویہ پر دنیا کی طمع غالب ہوگئی تھی اور وہ حضرت علی کو منبر پر لعنت کیا کرتے جیسے ابن جریر محمد نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور امام حسن نے معاویہ سے جس شروط پر صلح کی تھی ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کی حضرت علی کو ان کے سامنے روبرو برا نہ کہیں گے اور حضرت علی کیا معاویہ کو تمام خاندان رسالت سے دلی دشمنی تھی۔

তাদের কাছে ইতিহাসের এই নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পৌঁছেনি যে, মু'আবিয়া মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলীর বিষোদগার করতেন বরং খতীবদের প্রতি তার নির্দেশ ছিলো, খুতবায় যেন হযরত

আলীর সমালোচনা করা হয় এবং তাঁর ওপর অভিসম্পাত করা হয়। বাস্তব কথা হচ্ছে, মু'আবিয়া পৃথিবীর মোহে পড়েই হযরত আলীর বিষোদগার করতেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে জারীর তার ইতিহাস গ্রন্থে এই কথাটি উল্লেখ করেছেন। হযরত হাসান (রা.) মু'আবিয়ার সাথে যেসব শর্তের ওপর চুক্তি করেছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত ছিল, তিনি জনসম্মুখে হযরত আলীর (রা.) সমালোচনা করবেন না। বাস্তব কথা হচ্ছে, শুধু হযরত আলীর সাথে নয়, বরং পুরো আহলে বাইতের সাথে মু'আবিয়ার শত্রুতা ছিল। (প্রাগুক্ত)

একই গ্রন্থে আছে,

لا تسبوا اصحابی (اسی حدیث کے بموجب گو معاویہ اور مغیرہ اور عمر بن العاص اور سمرہ بن جندب اور ابو سفیان اور مروان کے بعض اعمال مہلک ہیں مگر انکو برا کہنے سے اپنی زبان کو روکے رہتے ہیں۔

তোমরা আমার সাহাবীদের বিষোদগার করো না।এই হাদীসের চাহিদা হলো, কোনো সাহাবী সম্পর্কে সমালোচনা না করা। যদিও মু'আবিয়া, মুগীরা, সামুরা, আমর, আবু সফিয়ান এবং মারওয়ানের অনেক কর্মকাণ্ডই ঈমানবিধ্বংসী। (প্রাগুক্ত)

একই গ্রন্থকারের আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে, 'কানযুল হাকায়িক মিন ফিকহি খায়রিল খালায়িক'। সেখানে বলা হয়েছে,

ويستحب الترضى للصحابى غير ابى سفيان ومعاية وعمرو بن العاص ومغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب۔

আবু সুফিয়ান, মু'আবিয়া, আমর, মুগীরা এবং সামুরা, এই পাঁচজন ছাড়া অন্য সব সাহাবীর ক্ষেত্রে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বলা মুস্তাহাব। (পৃ. ২৩৪)

এই ওয়াহীদুজ্জামান, যে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন মারাত্মক মন্তব্য করেছে তার সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হচ্ছে,

اعتراف حقیقت کے طور پر یہ تسلیم ہے کہ نواب وحید الزمان کے قلم سے بعض اوقات بعض صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں صادر ہوگئی ہیں جو نا مناسب ہیں نہیں صادر ہونا چاہئے۔

বাস্তবতা স্বীকারপূর্বক বলতে হচ্ছে, অনেক সময় নবাব ওয়াহীদুজ্জামানের কলম থেকে কিছু সাহাবী সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে , যা সমুচিত হয়নি। (ড. ইদরীস মুবারকপুরী কর্তৃক রচিত সালাফিয়্যাত কা তা'আরুফ নামক গ্রন্থের পার্শ্বটিকায় মুক্তাদা হাসান আযহারী উপরোক্ত মন্তব্য করেন। পৃ. ৩৪০)

বন্ধুরা! অপরাধ কত গুরুতর! আর অজুহাত কত লঘু। একেই বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যর্থ অপপ্রয়াস।

লা-মাযহাবীদের আরেক পুরোধা 'মুহাম্মদ সাহেব জোনাগড়ী' রচনা করেন 'শাময়ে মুহাম্মদী'। ওই গ্রন্থের কয়েকটি শিরোনাম হচ্ছে,

حضرت فاروق کی سمجھ کا معتبر نہ ہونا، صحابہ کی درایت معتبر نہیں

অর্থ: হযরত ওমরের ফাহম এবং সাহাবীদের দেরায়ত (তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বোধশক্তি) গ্রহণযোগ্য নয়। (পৃ. ১৯)

লা-মাযহাবীদের অন্যতম গুরু 'মু. নজীর হোসাইন দেহলভী' রচনা করেন 'ফাতাওয়ায়ে নজীরিয়্যাহ'। সেখানে বলা হয়েছে,

فہم صحابہ حجت شرعیہ نہیں کما ثبت فی اصول الحدیث

সাহাবীর মতামত শরীয়তের দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (খ. ১, পৃ. ৬২২)

লা-মাযহাবীদের ফাতাওয়া সংকলন 'ফাতাওয়ায়ে আহলে হাদীসে' বলা হয়েছে,

ڈاڑھی کے متعلق مندرجہ تین صحابہ کرام سے امر نبوی منقول ہے (۱) حضرت ابن عمر (۲) حضرت ابوھریرہ (۳) حضرت ابن عباس، اگر چہ ہمارے نزدیک قابل عمل راوی کی درایت نہیں بلکہ رسول اللہ کی روایت ہے۔

অর্থাৎ, দাড়ি সম্পর্কে রাসূল (সা.) থেকে তিনজন সাহাবী আদেশসূচক বাণী বর্ণনা করেছেন। ১. হযরত ইবনে উমর (রা.), ২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.), ৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)। যদিও আমাদের মতে বর্ণনাকারীর মতামত গ্রহণযোগ্য নয়, বরং রাসূল (সা.)-এর হাদীসই আমাদের মতে গ্রহণযোগ্য। (পৃ. ৪৯৬)

তাদেরই আরেকটি গ্রন্থ 'আরফুল জাদিতে' বলা হয়েছে,

دراصول تقرر شدہ کہ قول صحابہ حجت نیست

হাদীসের মূলনীতিতে এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কোনো সাহাবীর মতামত বা উক্তি শরীয়তের প্রমাণ নয়। (পৃ. ১০১০) এই অশ্রাব্য মন্তব্যও করা হয়েছে সেখানে,

بلکہ بعض اہل علم ایں استمناء از صحابہ نزد غیبت از اہل خود کردہ اند

অর্থাৎ, হস্তমৈথুন বৈধ হওয়ার তারা দলিল দিচ্ছে, অনেক সাহাবী যখন স্ত্রীদের থেকে দূরে অবস্থান করতেন তখন হস্তমৈথুন করতেন। (নাউজুবিল্লাহ) (পৃ. ২০৭)।

'ফাতাওয়ায়ে আহলে হাদীস' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে,

کہ روایت اصل میں ابوہریرہ کا فعل ہے جو عمار بن یاسر کیطرح عملی غلطی ہے۔

অর্থ : এই বর্ণনাটি মূলত হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর নিজস্ব কর্ম, রাসূল (সা.)-এর হাদীস নয়, যা আম্মার ইবনে ইয়াছিরের মত কর্মগত ভুল বলে বিবেচনা করা হবে। (পৃ. ৫০৬)

'ফাতাওয়ায়ে ওলামায়ে হাদীস' নামক

গ্রন্থের ৬ নং খণ্ডে বলা হয়েছে,

صحابی کا عمل دلیل نہیں ہوتا۔

অর্থাৎ, সাহাবীর কর্ম শরীয়তের দলিল নয়। (পৃ. ৩৭২)

'আমীনুল্লাহ পেশাওয়ারী' কর্তৃক রচিত 'ফাতাওয়াদ্দীনিল খালিস' প্রথম খণ্ডে আছে,

উদাহরণস্বরূপ ছমুরা শরাবের ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ মনে করতেন। আবু তালহা রোযাদারের জন্য উল (এক প্রকার মিষ্টি দ্রব্য) খাওয়া বৈধ মনে করতেন। উসমান, আলী, তালহা এবং ইবনে মাসউদ প্রমুখ সাহাবী জুনুবীর (যার ওপর গোসল ফরজ) জন্য তায়াম্মুম অবৈধ মনে করতেন। হায়েজ অবস্থায় যেসব নামায ছুটে যায়, তা পুনরায় পড়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। ছামুরা ইবনে জুনদুব হযরত আবু বকর (রা.) স্বপ্নের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) হাবশার মুহাজিরদের উদ্দেশে বলেছিলেন, আমরা রাসূল (সা.)-এর ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। কিন্তু নবী (সা.) তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। হযরত বেলাল (রা.) এক ছা' খেজুর দুই ছা' (২৮০ তোলার ওজন বিশেষ। প্রায় সাড়ে তিন সের পরিমাণ ওজন) খেজুরের পরিবর্তে বিক্রি করেন। পরে অবশ্যই রাসূল (সা.) তা প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত আদী (রা.) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত খায়তে আবয়ায দ্বারা উদ্দেশ্য সাদা সুতো মনে করেছিলেন। এই ধরনের আরো অনেক বর্ণনা ইমাম ইবনে হাজম (রহ.) আহকাম নামক গ্রন্থে (খ.-৬, পৃ.-৮২-৯১) উল্লেখ করেছেন।

এখন বলুন, সাহাবায়ে কেরামদের যে ইজতিহাদী ভুল হয়েছিল, সেগুলোতে কি তাদের অনুসরণ করা যাবে? (খ. ১ পৃ. ২৫১) লা-মাযহাবীদের প্রধান গুরু 'সানাউল্লাহ আমরতছরী' 'ফাতাওয়ায়ে ছনাইয়্যায়' উল্লেখ করেন যে,

ہم فاروقی تو نہیں محمدی ہیں ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا آنحضرت کا کلمہ پڑھا ہے۔

আমরা ফারুকী নয়, বরং মুহাম্মদী, আমরা তার কালিমার পাঠ করিনি, বরং মুহাম্মদ (সা.)-এর কালিমা পাঠ করেছি। (খ. ২, পৃ. ২৫২)

লা-মাযহাবীদের আরেক পুরোধা ফয়েজ আলম সিদ্দিকী সাইয়িদুনা হাসান ইবনে আলী নামক গ্রন্থে লিখেছেন।

کیا حضرات حسنین صحابی تھے؟ آج ہر مسلمان اندھا دھند اس بات کی رٹ لگائے جا رہا ہے کہ حضرات حسنین صحابی تھے

হযরত হাসান এবং হোসাইন (রা.) কি সাহাবী ছিলেন? বর্তমানে প্রায় সব মুসলমান এই অন্ধ বিশ্বাসে মত্ত যে, হযরত হাসান এবং হোসাইন (রা.) সাহাবী ছিলেন। (পৃ. ২০)

একই গ্রন্থে বলা হয়েছে-

ان حقائق وشواہد کی روشنی میں حضرات حسنین کو زمرہ صحابہ میں شمار کرنا صریحا سبائیت کی ترجمانی ہے، یا اندھا دھند تقلید کی خرابی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرات حسنین کو زمرۂ تابعین میں ہی شمار کیا جا سکتا ہے۔

এসব বাস্তবতা এবং প্রমাণাদির পরও হযরত হাসান হোসাইনকে সাহাবীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করা স্পষ্টত সাবায়ীদের দালালি করারই নামান্তর অথবা এটা অন্ধ অনুকরণেরই বিষফল। অন্যথায় স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা হচ্ছে, হযরত হাসান হোসাইন (রা.) তাবেঈনদেরই অন্তর্ভুক্ত। (পৃ. ২৩)

ওই বেয়াদব আরো লিখেছে,

حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حسن کو اپنی ماں کا دودھ پینے کا موقعہ نہ ملا تھا آپ کی پرورش دوسرے دودھ پر ہوئی تھی اس لئے صحبت کے لحاظ سے آپ کمزور تھے اور کما حقہ نشو ونما نہ پا سکے تھے اس پر کثرت سے حرم کی زندگی کے دلدادہ تھے جس کی وجہ سے آپ کو بعض روایات کے مطابق آخری ایام میں سل کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔

বাস্তব কথা হচ্ছে, হযরত হাসান (রা.) নিজ মায়ের দুধ পান করার সুযোগ পাননি। তার লালন-পালন অন্যের দুধ দিয়ে হয়েছিল। তাই স্বাস্থ্যের দিক থেকে তিনি একটু দুর্বল ও রোগা টাইপের ছিলেন। সাথে সাথে তিনি হেরেমের আড়ম্বর ও জৌলুসপূর্ণ বিলাসী জীবনের প্রত্যাশী ছিলেন। এ জন্য বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি শেষ জীবনে ফুসফুসের ক্ষতে আক্রান্ত ছিলেন। (পৃ. ৮০) (নাউযুবিল্লাহ)

লা-মাযহাবীদের আরেকটি মৌলিক গ্রন্থ ফয়জ আলম সিদ্দিকী কর্তৃক রচিত খেলাফতে রাশেদা। ওই গ্রন্থে তিনি লেখেন,

مگر حضرت علی شرف ومجد کے بلند مقامات پر فائز ہونیکے باوجود تاریخ اسلام میں کوئی ایسا نقش چھوڑنے پر قادر نہ ہو سکے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ آپ بھی خلیفہ حق تھے۔

কিন্তু হযরত আলী (রা.) সম্মান ও মর্যাদার অনেক উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হলেও ইসলামের ইতিহাসে তার এমন কোনো প্রোজ্জ্বল ভূমিকা নেই, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনিও একজন সত্যনিষ্ঠ খলীফা ছিলেন। (পৃ. ১৪)

ওই গ্রন্থের অন্য জায়গায় আছে,

اور ہم دیکھتے ہیں سیدنا علی کے نام نہاد دور خلافت میں صحابہ کرام اور تابعین کے گروہ کے گروہ عراق اور حجاز سے بھاگ کر شام میں رہائش پذیر ہو رہے تھے۔

আমরা দেখতে পাচ্ছি, হযরত আলীর তথাকথিত খেলাফতামলে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনরা দলে দলে ইরাক এবং হেজাজ পরিত্যাগ করে সিরিয়ায় স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছিলেন। (পৃ. ৩৯)

ওই গ্রন্থে আরো আছে,

اس امر کی روشنی میں یہ کہنا کہ سیدنا ذوالنورین کی شہادت عظمی کے بعد سیدنا علی ہی صحیح

معنوں میں خلافت کے حقدار تھے ایک قسم کا تاریخی مذاق اور تاریخ نویس کا مسخرہ پن ہے۔

উল্লিখিত কথার আলোকে এই মন্তব্য করা, হযরত উসমান (রা.)-এর মর্মন্তুদ শাহাদতের পর হযরত আলীই প্রকৃত অর্থে খেলাফতের যোগ্য ছিলেন। ঐতিহাসিকদের ভাঁড়ামি আর উপহাস বৈ কিছুই নয়। (পৃ. ৬২)

একই গ্রন্থে আছে,

پھر یہ کہاں کی علمیت اور دینداری ہے کہ حضور صادق ومصدوق کے جواں سال نواسوں کو چھوڑ کر جنہیں شرف صحابیت بھی حاصل تھا حضرات حسنین کو جمعہ کے خطبات میں سید شباب اہل الجنۃ اور سیدین الشہیدین وغیر خطابات سے نوازا جائے۔

এটি কোন ধরনের জ্ঞান ও ধার্মিকতা যে, রাসূল (সা.)-এর অন্য পরিণত দৌহিত্রদের আলোচনা বাদ দিয়ে, যারা সাহাবী হওয়ার বিরল মর্যাদায়ও ভূষিত ছিলেন, জুমুআর খোতবায় হযরত হাসান এবং হোসাইনকে জান্নাতের যুবকদের অধিপতি এবং সৌভাগ্যবান শহীদের অভিধায় বিশেষিত করা? (অর্থাৎ এটা একেবারে অযৌক্তিক ও অনুচিত) (পৃ. ১১৫)

سیدنا حسن کے موت کے متعلق میں اپنی تالیفات عترت رسول اور حسن بن علی میں بدلائل ثابت کر چکا ہوں کہ کثرت جماع، ذیابیطس اور تپ محرقہ سے ہوئی، آپ کہاں شہید ہوئے

আমি আমার একাধিক গ্রন্থে যথা ইতরাতে রাসূল (সা.), হাসান ইবনে আলী (রা.), এ কথা দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছি যে, হযরত হাসান (রা.) অধিক স্ত্রী সহবাস, বহুমূত্র রোগ এবং পালা জ্বরের কারণে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি শহীদ হলেন কোথায়? (পৃ. ১১৫)

একই গ্রন্থে আছে,

دوسرے نمبر پر حضرت ابوذر غفاری کا نام ہے جو ابن سبا کے کمیونسٹ نظر سے متاثر ہو کر ہر کھاتے پیتے مسلمان کے پیچھے لٹھ لیکر بھاگ اٹھتے تھے۔

দ্বিতীয় নাম্বারে হযরত আবু জর গেফারীর নাম, যিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার (মুনাফিকদের সর্দার) কমিউনিস্ট মতবাদে প্রবাবিত হয়ে প্রত্যেক সচ্ছল মুসলমানদেরকে লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন। (পৃ. ১৪৩)

'শাহাদতে সায়্যিদুনা জিন্নুরাইন' (রা.) নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা থেকে এ কথা দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়ে গেল যে, হযরত ফারুক আজম (রা.)-এর বিরুদ্ধে গজিয়ে ওঠা আন্দোলন সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী জ্ঞাত ছিলেন এবং তারা যথাসম্ভব তাকে ইশারা-ইঙ্গিতে সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু কোনো সাহাবী কেন হযরত উমর (রা.) কে স্পষ্টভাবে এ কথাটি খুলে বলেননি? এ থেকে কি এ কথা প্রতীয়মান হয় না যে, এর পেছনে একটি বড় শক্তির হাত ছিল? ওই ষড়যন্ত্রের রহস্য আজও পর্দার অন্তরালেই রয়ে গেছে। (পৃ. ৩২)

অন্যত্র বলা হয়েছে, এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হযরত উসমান (রা.)-এর হন্তারক কারা ছিলো, তা সবার জানা ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্যের বিষয়, শুধু হযরত আলী (রা.) তাদের সম্পর্কে ছিলেন ঘোর অন্ধকারে! অথচ সব ঘটনার অকুস্থল ছিল তার সামনে। হযরত আলী (রা.) যদি খেলাফতের মসনদে সমাসীন হওয়ার সাথে সাথে ওই সব গুটিকয়েক বিশৃঙ্খলাকারীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করতেন, তাহলে তিনিও তাঁর পূর্বসূরিদের মতো শান্তির সাথে রাজ্য পরিচালনা করতে পারতেন। তার অবহেলার দরুন বিশৃঙ্খলাকারীদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীতে তারাই হযরত আলী (রা.) কে শহীদ করে ফেলে। তাদের কারণেই হযরত হাসান (রা.) লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। হযরত হোসাইন (রা.)-এর মর্মন্তুদ শাহাদতের পেছনেও তাদের কালো হাত ছিল বলে প্রায় সব ইতিহাসবেত্তা এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে ইয়াযিদের প্রতি অভিযোগের তীর তোলা হয়, তিনি হযরত হোসাইন (রা.)-এর হন্তারকদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলেন না কেন? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আজ পর্যন্ত কোনো পক্ষ এই অভিযোগ উত্থাপন করেননি যে, হযরত আলী (রা.) হযরত উসমানের (রা.) হত্যার প্রতিশোধ নিলেন না কেন? হযরত হোসাইন (রা.)-এর হত্যায় যারা সম্পৃক্ত ছিল, ইয়াযিদ তাদেরকে নিজের দরবার থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। অন্যদিকে হযরত আলী (রা.), হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যায় যারা জড়িত ছিল, তাদেরকে শাস্তির পরিবর্তে বড় বড় লোভনীয় পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। (পৃ. ৭৪)

তাহকীকে শাহাদতে হোসাইন নামক গ্রন্থে লা-মাযহাবীদের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ফয়েজ আলম সিদ্দিকী লিখেছেন, অগ্নিপূজকদের ষড়যন্ত্রের কারণে হযরত উমর (রা.) শাহাদত বরণ করেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) ও ইয়াহুদী অগ্নিপূজকদের সমন্বিত ষড়যন্ত্রে শহীদ হন। পরবর্তীতে তারাই হযরত আলী (রা.)-কে আত্মরক্ষার্থে খেলাফতের মসনদে সমাসীন করেন। (পৃ. ২)

একই গ্রন্থের অন্যত্র বলা হয়েছে, হযরত হোসাইন (রা.) সর্বপ্রথম কুফা সফর করেন। পরে তিনি স্বীয় মনোভাব পরিবর্তন করে কুফা থেকে ফিরে আসতে মনস্থ হলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাটা কি এ কথার ইঙ্গিত বহন করে না যে, তিনি সত্য প্রতিষ্ঠার

মানসে কুফা সফর করেননি। বরং সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়াটাই ছিল তাঁর প্রধান টার্গেট। (পৃ. ১৮)

লা-মাযহাবীদের আরেক গুরুজি 'মুহাম্মদ ইসহাক'-এর বক্তৃতা সংকলন 'খোতবাতে ইসহাক' থেকে সাহাবা বিদ্বেষের কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। এক জায়গায় বলা হয়েছে, হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনামল ছিল ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য এক বিভীষিকাময় যুগ। তার যুগে দ্বীনের অনেক মৌলিক বিষয় হয়তো ধ্বংস, নয়তো বিকৃত হয়ে যায়। তার শাসনামলে হযরত হুজর ইবনে ওয়ায়েল (রা.)-এর মতো রাসূলের প্রিয় সাহাবীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। হাকম ইবনে গিফারী (রা.)-এর মৃত্যুই হয়েছে এই দু'আ করা অবস্থায়, হে আল্লাহ! আমার ভাগ্যে যদি সামান্য হলেও কল্যাণ থাকে, তাহলে আমাকে এই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নাও। (পৃ. ৮)

মু'আবিয়ার শাসনামলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) তাকে কতবার মিনতি করলেন যে, হে মু'আবিয়া! রাসূলের আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা করো। কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী! মু'আবিয়ার সরাসরি উত্তর–না।

ওই গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় হযরত মু'আবিয়া (রা.)-কে খবীস (ভ্রষ্ট) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। (পৃ. ১৪,১৫)

একই গ্রন্থে বলা হয়েছে, সালেহ ইবনে মাহদী নামক জনৈক সালাফী আলেম লিখেছেন যে, লোকেরা হযরত আলী এবং মু'আবিয়ার মধ্যকার যুদ্ধবিগ্রহের আলোচনা করতে গিয়ে বলে যে, মু'আবিয়ার ইজতিহাদ (গবেষণা ও দর্শন) ভুল ছিল। অর্থাৎ, তার পক্ষ থেকে অনেক খোঁড়া অজুহাত উপস্থাপন করা হয়। আমি বলি, এগুলো কিছু নয়। এ ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করা যেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকারই নামান্তর। বাস্তব কথা হচ্ছে, মু'আবিয়া ছিল ইতিহাসের এক খলনায়ক। তার ক্ষমতালিপ্সা ছিল সর্বজনবিদিত। তার কাছে ধর্মের কোনো গুরুত্বই ছিল না। সে নিজেও দ্বীন-ধর্ম থেকে যোজন যোজন দূরত্বে ছিল। ক্ষমতার লাভের জন্য সব ধরনের শত্রুতা, ধূর্তামি, প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজি ছিল তার কাছে ডাল-ভাতের মতো সহজ। এমন কোনো ইতরামি আর অন্যায় ছিল না, যা সে ধর্মের নামে চালিয়ে দেয়নি। সর্বশেষ ইয়াযিদকে ওলী আহদ (খেলাফতের উত্তরাধিকারী) নির্বাচন করার মাধ্যমে ইসলামের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকতেও সে কুণ্ঠাবোধ করেনি। প্রথম প্রথম সে সাহাবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত এবং লোকদের মুখ বন্ধ করার জন্য তাদেরকে যে সে কত ঘুষ দিয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। চার বছর পূর্ব থেকে তার বায়আত হতে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা আরম্ভ করে। (পৃ. ১৭)

আল্লাহ সাক্ষী! মু'আবিয়ার শাসনামলে ইসলামের ওপর যে ভয়ানক ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেছে, তার কোন অংশে কেয়ামত থেকে কম নয়। কিন্তু এর পরও লোকেরা কেন তার গুণকীর্তন করে, তা বোধগম্য নয়। (পৃ. ৪৫)

'তানবীরুল আফাক ফী মাসআলাতিত্তালাক' লা-মাযহাবীদের মৌলিক একটি প্রামান্য গ্রন্থ। লেখক, মুহাম্মদ রঈস নদভী। ওই গ্রন্থের এক স্থানে লেখক তালাকের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এটি এক স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা যে, কোনো সাহাবী এ কথা দাবি করেননি যে, একসাথে তিন তালাক পতিত হওযার ফাতাওয়া কুরআন-হাদীসের কোনো স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছি। বরং অনেক বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে,

جاء رجل الى على بن ابى طالب فقال انى طلقت امرأتى الفا قال بانت منك بثلاث اقسم سائرهن بين نسائك

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল যে, আমি আমার স্ত্রীকে এক হাজার বার তালাক দিয়েছি। প্রত্যুত্তরে হযরত আলী (রা.) বললেন, তিন তালাকের কারণে তোমার স্ত্রী তালাকে বাইন (এমন তালাক যার পর বিবাহ দোহরানো বা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।) হয়ে গেছে। অবশিষ্ট তালাকগুলো তোমার অন্য স্ত্রীদের ওপর বণ্টন করে দাও। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৩-১৪, সুনানে দারে কুতনী ২/১৪৩৩)

স্পষ্ট কথা যে, পূর্বোক্ত কথা হযরত আলী (রা.)-এর অতিমাত্রার রাগেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অন্যথায় তিন তালাকের অধিক তালাক অন্য স্ত্রীর ওপর বণ্টন করার কথা কোনো ইমামই বলেন না। অনুরূপভাবে যেসব সাহাবী একের অধিক প্রদত্ত তালাক পতিত হয় মর্মে ফাতাওয়া দিয়েছে, তাদের ফাতাওয়াকেও রাগ এবং ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নেয়া হবে। অর্থাৎ এক সময়ে একের অধিক তালাক দিলে তা পতিত হবে না। যেসব বর্ণনায় দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে এ কথা বর্ণিত আছে, তিনি একের অধিক তালাক পতিত হয় বলে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন, এ পদক্ষেপ নেয়ার কারণও শুধুমাত্র এটাই যে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে যে উদাসীনতা, বেপরোয়াভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া। অন্য কিছু (তথা বাস্তবে তালাক পতিত হওয়া) নয়। (পৃ. ৪১)

একই গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদিও এ ধরনের তালাক পতিত হওয়ার ঘটনা অনেক সাহাবী থেকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত

আছে। কিন্তু এ ধরনের ফাতাওয়া থেকে কস্মিনকালেও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, ফাতাওয়া প্রদানকারী এ ধরনের তালাককে কুরআন-সুন্নাত অনুযায়ী মনে করে। বিভিন্ন কিতাবে স্পষ্ট বর্ণিত আছে, অনেক সাহাবী যদিও তিন তালাক একসাথে পতিত হয় মর্মে ফাতাওয়া দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা এ কথাও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন যে, একসাথে তিন তালাক পতিত হওয়া, এটি কুরআন-সুন্নাহর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে, অকাট্য হারাম এবং অবৈধ। (পৃ. ৪২)

মুহাম্মদ ইসমাঈল সালফী, লা-মাযহাবীদের অন্যতম পুরোধা। তার রচিত ফাতাওয়ায়ে সালফিয়্যাহ নামক গ্রন্থে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন যে,

كان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه

হযরত ইবনে উমর (রা.) হজ এবং উমরা করার পর দাড়ির যে অংশ একমুষ্টির বাইরে চলে যেত, তা কেটে ফেলতেন। (জামিউস সহীহ ১/ ২৭২)

সাধারণভাবে সব সাহাবী বিশেষভাবে হযরত ইবনে উমর (রা.) রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে আপসহীন এবং অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু তার এই কাজটি হাদীসের বিশুদ্ধ বর্ণনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। (পৃ. ১০৭)

তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় যদিও নিজেদেরকে সাহাবীপ্রেমিক বলে দাবি করে সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকায় ফেলতে চায়,

কিন্তু আমরা তাদেরই রচিত গ্রন্থাবলি থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের আসল ভয়ংকর চেহারা উম্মাহর সামনে উন্মোচন করার প্রয়াস পেয়েছি। তারা নিজেদেরকে যতই মনোহরী মোড়কে উপস্থাপন করুক না কেন, তাদের ভেতর যে ভয়ংকর এবং কুৎসিত কালো বিড়াল বসবাস করে, আমরা তাদের সেই থলের বিড়াল বের করতে সামান্য প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। এত দীর্ঘ সাতকাহনের অবতারণা এ জন্য করতে হলো, যেন সম্মানীত শ্রোতাবৃন্দ অনুধাবন করতে পারেন যে, আমাদের সাথে লা-মাযহাবীদের বিরোধ কি কয়েকটি মুষ্টিমেয় মাসআলায়? না মূল আক্বীদায়? ইসলাম ধর্মে সাহাবীদের স্থান কোথায়? আর তারা সাহাবীদেরকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে থাকে? ইতিহাসের অনির্ভরযোগ্য এবং বানোয়াট বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে রাসূল (সা.)-এর জন্য জীবন উৎসর্গকারী এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সাহাবীগণকে কি ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়? না তাদের পরিমাপ করতে হলে প্রয়োজন কুরআন-হাদীসের কষ্টিপাথর?

আশা করি, শ্রোতাবৃন্দ বিষয়গুলোর সঠিক জবাব পেয়েছেন। সামনের সংখ্যা থেকে তাদের সাথে বিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা শুরু করা হবে। ইনশাআল্লাহ!

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও অনুবাদ :
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১